Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনা

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোছা. তছলিমা খাতুন
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.3
Pages	২৫-৫৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসচেতনা

মোছা. তছলিমা খাতুন*

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের প্রারম্ভিক লগ্নে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় বহুযুগ-প্রচলিত সনাতন ভাবাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার সংঘাত পরিদৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য জীবনবোধের অভিঘাতে ভারতীয় তথা বাঙালির জীবন ও সমাজব্যবস্থায় সাধিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন এবং ভারতীয় জীবনবোধের সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার ঘটে অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনার পথিকৃৎ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ যুগ-সন্ধিক্ষণের একজন অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্ব, যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়েও পাশ্চাত্যের নবচেতনার আবহে ঋদ্ধ। ভূদেবের সৃষ্টিকর্মে আমরা এসবের প্রতিফলন দেখি; বিশেষ করে তাঁর "সফল স্বপ্ন" এবং "অঙ্গুরীয় বিনিময়" উপন্যাসে। ধর্মাবেগ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তাগিদ, দেশপ্রেম এবং আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কার কেন ও কীভাবে ভূদেবকে ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির পুরোভাগে স্থান করে দিয়েছে এ প্রবন্ধে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাঙালির ইতিহাসচেতনার পটভূমিতে এক জটিল দ্বন্দ্বময় কালসীমা উনিশ শতক। কারণ, এই শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বাঙালি জীবনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু এই নবচেতনার যাত্রাপথ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগরণের সংঘাত, সমাজ জীবনের ভাঙা-গড়া, উপনিবেশ-উদ্ভূত বিচিত্র সংকট প্রভৃতি এই চেতনার পথকে দ্বন্দ্বসংকুল করেছে। কালের এই অস্বাভাবিক গতির মধ্যে যারা স্বাবলম্বী জীবনাদর্শে উন্নীত হতে সমর্থ হন, তাদের মধ্যে অগ্রণী প্রতিভা ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি মনীষার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ তাঁর জীবন-ভাবনায় নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছিল : 'তার বিশ্বাস ছিল, য়ুরোপের কর্ম এবং ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম চেতনাকে সমন্বিত করতে পারলে ভারতের যথার্থ মুক্তি হবে" (অসিতকুমার, ১৯৯৭ : ৩১৯)। হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র ভূদেব

*সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু কলেজে লেখাপড়া করলেও তিনি নিজেকে একজন স্বতন্ত্র মানসিকতার ব্যক্তি হিসবে গড়ে তুলেছিলেন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে কীভাবে তাঁর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ-প্রেম জেগে ওঠে তার পটভূমির কথা তিনি তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় ভাগ) গ্রন্থের 'অধিকারীভাব ও স্বদেশানুরাগ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন : 'যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু জাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হতে দক্ষ কন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়াছি যে, "আর্য্য বংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ 'ইশ্বরী-দেহ'" (প্রণব রঞ্জন, ১৩৭৫ : ২২১)। অধ্যয়নকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগের এই অনুপ্রেরণা তাঁর পরবর্তী জীবনের সাহিত্য-সাধনায় অত্যন্ত সাফল্য বয়ে এনেছিল। তবে এই শিক্ষা তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবিমুখ করে তোলেনি, বরং যেখানে প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের সঙ্গে নবীন য়ুরোপীয় জীবনবাদের প্রায় অহিনকুলসম্পর্ক। ভূদেব সমস্ত বিপরীত তরঙ্গবিক্ষোভ নিজে ধারণ করে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মজীবন, লোকশ্রেয় জ্ঞান, সমাজ ও পারিবারিক আদর্শের একনিষ্ঠ আনুগত্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানানুশীলন, সংস্কারমুক্ত আচরণ – ভূদেবের ব্যক্তিগত জীবনে এ দুই আদর্শ একসূত্রে মিলিত হয়েছিল। এদিক থেকে তাঁকে উনবিংশ শতাব্দীর যথার্থ যুগনায়ক বলা যায়। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যথার্থ সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও পরিবারের সম্বন্ধ কীভাবে সুফলপ্রদ হতে পারে, ভূদেব নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে তার মীমাংসা করেছেন। শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, ব্যক্তিগত জীবনে তার অনুশীলনও করেছেন তিনি। তিনি জীবন-প্রত্যয়ের দিক থেকে বিচক্ষণ বাস্তববাদী ছিলেন। এ উক্তিতেও তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়, 'বাঙালিকে আধুনিক জগতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং মূল ভারতীয় বুনিয়াদে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে তিনি জীবনচর্চার যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তা আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনের এবং সমাজের কল্যাণবোধের উপর দাঁড়িয়ে আছে' (অসিতকুমার, ১৯৯৭ : ৩১৯)। এ কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সমাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। মুকুন্দ দেব লিখেছেন, 'খুব কম ইংরেজই বোধ হয় তাহার ন্যায় এত অধিক ইংরেজি পুস্তক পড়িয়াছেন। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, দর্শন (প্রাচীন এবং নব্য) ইংরেজিতে ইউরোপীয়দিগের সকল উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদ পাঠে, সকল বিষয়ের শুষ্ক রিপোর্টের তথ্য সংকলনেও তাহার আনন্দ হইত' (মুকুন্দ, পৃ. ১৬৯-১৭০)।

ভূদেবের লেখায় প্রচণ্ডভাবে যুগের প্রভাব পড়েছিল এবং এই যুগ-চেতনা ছিল তার মানস-ভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তিনি সব রকমের কূপমণ্ডূকতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আগ্রহ ও একাগ্রতার সঙ্গে অনুশীলন করতেন। P. R. Sen-এর ভাষায়,

> Bhudeb the staunch supporter of Hinduism was a voracious reader of western philosophy, and studied with discrimination that was usual with him, the doctrine of Herbert Spencer, Schopenhaur, Darwin, even at a very advance age, Bhudeb was a deligent student of Locke, Hume, Mill, kant and Hegel, as we may find out from his biography, which has been based on his diary entries as well as other records. It is curious that even such a book as Hartman's philosophy of the unconscious is discussed in great detail in his journal. (Sen, 1966 : 229)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিজে একজন গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ছিলেন উদার। তিনি মনে করতেন জন্মভূমির সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে একজোট হতে হবে, তবেই জন্মভূমি নামক রথটি চলবে। মুসলমানদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মতে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উভয়েই এখন একই দেশবাসী। সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট। ফলত তারা দুধ ভাই এমন বলা যেতে পারে। আবার মুসলমানদের ভারত শাসন সম্পর্কে বলেছেন, 'মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দিয়াছে। তাহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটি সর্ব প্রদেশ সাধারণ প্রিয় হিন্দী ভাষাপ্রাপ্ত হইয়াছে – হর্ম্ম শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট প্রণালী সংযুক্ত হইয়াছে – সৌজন্য রীতির আদর্শপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থই মহা ঋণগ্রস্ত' (কাশীনাথ, ১৩১৮ : ১৩-১৬)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় আজীবন শিক্ষা বিভাগ এবং শিক্ষা প্রচারের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন যেমন: 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' (১ম ও ২য়, ১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১৮৫৮), 'ইংল্যান্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩) এবং 'বাঙালার ইতিহাস' (১৯০৪)। এসব পাঠ্যপুস্তক সে সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এছাড়াও তিনি 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) এবং 'আচার প্রবন্ধ' ১৮৯২ নামে তিনটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থ তিনটি সম্পর্কে অসিতকুমার লিখেছেন, 'উনিশ শতকের বন্যা প্রবাহে যখন নব্যশিক্ষিত বাঙালির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল, যখন তার জীবনে আঁকড়ে ধরার

মতো কোন কিছু ছিল না, তখন ভূদেব উপযুক্ত সামাজিক প্রয়োজনে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সংযত ভাষায় এই প্রবন্ধ গ্রন্থে বাঙালি সৎগৃহস্থের কর্তব্যপথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন" (অসিতকুমার, ১৯৯৭ : ৩২০)। ভূদেব একাধারে একজন মনীষী, প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং লিখেছেন 'ক্লাসিক, সংযত ও স্থিতধী ধরনের রচনা।' (অসিতকুমার, ১৯৯৭ : ৩২১)

উনিশ শতকে মুঘল, রাজপুত, মারাঠা ও শিখ ইতিহাসকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ধুম পড়ে যায়। কারণ ইতিহাসের অপূর্ব ধীরত্ব ও ত্যাগের ইতিকথার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির সদ্য পরিচয় ঘটেছে মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের এসব মানব-মহিমায় পূর্ণ তথ্যাদি এবং রোমান্টিক ঐশ্বর্য তাদের উপন্যাস লেখায় উদ্বুদ্ধ করবে এটাই স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন বয়সে তরুণ এবং তিনিও ইতিহাসের একজন মুগ্ধ ও একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি রচনার সূত্রপাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইতিহাসের উপাদান অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেন। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁর ইতিহাসপ্রিয়তার কারণে। তিনি ইতিহাসের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। বিশেষ করে মুঘল ইতিহাসের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিষয় মুঘলদের ইতিহাস। 'মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কি রকম অনুরাগ ছিল তার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তাঁর মৌখিক পরীক্ষায়। হুগলিতে অবস্থিত গভর্ণমেন্ট নর্ম্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে চাকুরির জন্য লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে মৌখিক পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল কলকাতা মির্জাপুরস্থ রেভ. লঙ্ সাহেবের স্কুলে ইতিহাস পড়ানো। সেখানে বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন পাদ্‌রি লঙ্ সাহেব, উড্রো সাহেব এবং কালিদাস মৈত্র। সেখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনা করতে বলা হয়। তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল, তার শাসননীতি চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ওপর জ্ঞানগম্ভীর, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন' (দিলওয়ার হোসেন, ১৯৮৪ : ৯৩)। ইতিহাস সম্পর্কে ভূদেবের কৌতূহল কী রকম ছিল সে সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, 'আজীবন তিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন– তার পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংল্যান্ডের ইতিহাস (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০৪) ও স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫) সেই ইতিহাসপ্রিয়তার যথাযোগ্য বহিঃপ্রকাশ।' (অসিতকুমার, ১৯৯৭ : ৩২০-৩২১)

ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত এই লেখক প্রথম যে উপন্যাসটি লিখেছেন তার নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যে বছর ভারত উপমহাদেশের সিপাহিরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস কাঁপানো সিপাহি-বিপ্লব সংঘটিত করে। একই সময়ে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ভারতীয়দের মধ্যে একদিকে যেমন আধুনিক মননশীলতার বিস্তার ঘটে অপরদিকে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংঘটিত সিপাহি-বিপ্লবের পরিণামে লেখকমানসেও জাতীয়তাবাদী চেতনার অভ্যুদয় ঘটে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও স্বদেশী ও স্বজাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচনা করেছেন এবং তার এই উপন্যাসটি রচনার পটভূমিকা হিসেবে যে মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তা হলো উনিশ শতকের নবজাগরণ ও রোমান্স রচনার যুগপ্রবণতা, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য লেখকদের প্রভাব।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর *ঐতিহাসিক উপন্যাস* গ্রন্থে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটি ঐতিহাসিক আখ্যানের সংযোজন করেছেন। প্রথমটির নাম 'সফল স্বপ্ন' ও দ্বিতীয়টি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'।

সফল স্বপ্ন

'সফল স্বপ্ন' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংরেজ Hobert Caunter-এর *The Romance of History – India* গ্রন্থের 'The Traveller's Dream' অবলম্বনে রচনা করেছেন *'সফল স্বপ্ন'*। এটি মূলত সাধারণ একটি রচনা যেখানে একজন পথিকের রাতের স্বপ্ন সফল হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এর বিশেষ সাহিত্যমূল্য গৌণ এবং ঐতিহাসিক কাহিনি হিসেবে বৈচিত্র্য না থাকলেও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যকার সহজাত জীবপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকভাবে কর্তব্যসাধনের পরিণাম হিসেবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ যোগ্যতাবলে রাজমন্ত্রিত্ব লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। শুধু তাই নয়, ভগবৎপ্রেম, কর্তব্য-নীতি-নিষ্ঠার মাধ্যমে একজন ক্রীতদাসের রাজাকে সন্তুষ্ট করে প্রথমে তার কন্যাকে বিয়ে এবং পরবর্তীকালে রাজত্ব লাভের বিশদ বর্ণনা আছে গল্পাংশে। সে সঙ্গে সামান্য অলৌকিকতার ছাপও আছে গল্পে, যা পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে সক্ষম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র ভূমিকায় লিখেছেন "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৮ : ২৫৮)।

গজনির শাসক সবুক্তগীনের জীবন ও কর্মকে অবলম্বন করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন'। সবুক্তগীন সামান্য ক্রীতদাস থেকে নিজ কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাবলে গজনির শাসনকর্তার পদ দখল করেছিলেন।

এই ব্যক্তির কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়েই হয়তো তিনি এ উপন্যাস লেখার অনুপ্রেরণা পান যদিও উপন্যাসে সবুক্তগীনের কার্যাবলির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। ক্ষমতালাভ করার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে। সবুক্তগীনের দাসবৃত্তি থেকে রাজ্যপ্রাপ্তির কাহিনির মধ্যে যে অ্যাডভেঞ্চার ও রোমান্স বিদ্যমান, তা থেকেও তিনি আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। না হলে, সবুক্তগীনের থেকেও অনেক ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন সেই সময়, যাদের নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেননি। যেমন সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ, যিনি ১৭ বার ভারত বিজয় করেছিলেন, ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হওয়ার পর কীভাবে রাজ্যের অধিকারী হলেন তা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য; ক্ষমতারোহণের পরের কোনো ঘটনার উল্লেখ সেখানে নেই।

'সফল স্বপ্ন' উপন্যাসের কাহিনি নিম্নরূপ :

একদিন এক অশ্বারোহী গান্ধার দেশের নির্জন পথে গহীন বনে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ান এবং বনের সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ একটি সিংহ তার ঘোড়াটিকে আক্রমণ করে। সিংহকে মেরে তিনি ঘোড়াকে মুক্ত করলেও আঘাত গুরুতর হওয়ার কারণে ঘোড়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি বাহনশূন্য হয়ে ব্যথিত মনে পথ চলতে শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ কাননের কুটিল পথ চলার ফলে তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখতে পান। সেখানে এসে দেখেন এক হরিণী তার শাবকদের নিয়ে তৃণ ভক্ষণ করছে। তিনি তার আহারের জন্য একটি শাবক ধরেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তিনি কাঠে আগুন জ্বালিয়ে হরিণ ছানাটিকে খাবারের উপযোগী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন – এমন সময় দেখতে পান অদূরেই দাঁড়িয়ে আছে মা হরিণ। সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পশুর মধ্যেও মানুষের মত বাৎসল্যভাব অবলোকন করে তিনি অভিভূত হন এবং ছানাটি ছেড়ে দেন।

পথিক এরূপ উদারতার পরিচয় দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করলেন। রাত্রি উপস্থিত হলো। তিনি সামান্য কিছু আহার সেরে একটি বৃক্ষতলায় শয়ন করলেন। ক্লান্ত পথিক ঘুমন্ত অবস্থায় একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, "মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ময় দেবমূর্তি অবতীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন– "রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃতি করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখ-দুঃখভাজন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন এবং তার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুজাতির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৬১-২৬২)।

এই বলে দেবমূর্তি উধাও হয়ে যায়। যখন পথিকের ঘুম ভেঙে যায় তখনও রাত্রি। তিনি উত্তেজিত মনে ভোর হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং ভোর হলে তিনি পুনরায় যাত্রা করলেন। অপরিচিত কানন পথে একাকী চলতে চলতে তার পূর্বের রাত্রির স্বপ্নের কথা বারবার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগল। তিনি ভাবলেন, সত্যিই কি এই স্বপ্ন সত্য হবে, আবার ভাবলেন আমি এদেশের নাম-ধামবিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এদেশে একাধিপতি হবো এটি স্বপ্নের বিষয় হতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রতাবস্থায় যে সমস্ত ভাব বা কল্পনা মনের মধ্যে ভিড় করে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার আবির্ভাব। সুতরাং স্বপ্ন কখনো বাস্তবরূপ লাভ করে না। এই বলে শুদ্ধাত্মা পথিক সকল চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। পথিক এরূপ চিন্তামগ্ন অবস্থায় বনের পথ অতিক্রম করতে করতে হঠাৎ এক জায়গায় কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেলেন এবং সহযোগিতার আশায় তাদের সম্মুখে গিয়ে পথের সন্ধান জানতে চাইলেন। খুব শীঘ্রই তার ভুল ভাঙল, কারণ তারা ছিল বনদস্যু। পথিককে পণ্যজীবী বণিক মনে করে তার পথরোধ করলো এবং পরে যখন জানতে পারলো যে তিনি বণিক নন বরং এক পথহারা পথিক, তখন তাকে তাদের দলে যোগদানের আহ্বান জানালে তিনি তা অস্বীকার করলেন। এতে বনদস্যুরা তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আক্রমণ করলে তিনি তাদের সাহস ও বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেন। তার সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে বনদস্যুরা মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায়। অনেক বুঝিয়েও যখন পথিককে দস্যুবৃত্তিতে রাজি করাতে পারল না, তার নীতির কাছে বনদস্যুরা পরাস্ত হলো তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে আহত পথিককে গ্রামে নিয়ে দাসক্রেতার নিকট বিক্রয় করে দিল। চোরেরা মূল্য নিয়ে চলে যায়। পথিকের মনে আবার সেই স্বপ্নের স্মৃতি ভেসে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন, "আমি কি নির্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম! কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম! বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন বলা যায় না; কিন্তু যাহা হউক এমন কোন কর্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়' (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৬৬)। দাসক্রেতা পথিককে নিজ গৃহে নিয়ে তার শরীরের ক্ষত সারিয়ে তোলেন। সুঠামদেহী এই দাসের অধিক ক্রয় মূল্য চাওয়ায় কেউ ক্রয় করতেও চাইল না। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান প্রদেশাধিপতি (পরে গজনির শাসক) অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান আলেপ্তগীন এই দাসকে ক্রয় করে আপন পরিচর্যায় নিযুক্ত করেন। দাস হিসেবে কিছুকাল অবস্থান করার পর তিনি তার নিজ কর্মদক্ষতা, ধর্মপরায়ণতা ও প্রভুবাৎসল্যের কারণে আলেপ্তগীনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। একদিন ক্রীতদাসের নিকট তার পরিচয় জানতে চাইলে দাস বলে, "মহারাজ! আমার পূর্ববৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপ! আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা কলিফ্ ওথমানের (খলিফা ওসমান)

আজ্ঞানুবর্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য ভূপাল 'ইসুদগর্দ' তাহাদিগকের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৬৭)। দাস আরও বললেন, তার বাবা ধনী ছিলেন না কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সংসারের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি কর্মের সন্ধানে বের হন। তার ইচ্ছা ছিল কোন রাজপরিবারে যোদ্ধা হিসাবে যোগ দিবেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি বনদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং ক্রীতদাসরূপে বিক্রি হন। এতে তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে তিনি এখন আবার সেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে করেন।

আলেপ্তগীন তার জীবনবৃত্তান্ত শোনার পর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে রাজকার্যে নিয়োগ দেন। তার কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বসৈনাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করেন। এতবড় উচ্চপদ লাভ করার পর তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার। রাজা আলেপ্তগীনের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম জেহীরা। রাজা বহু চেষ্টা করেও তার কন্যাকে বিয়ে দিতে পারেন নাই। অবশেষে কন্যা প্রধানমন্ত্রীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজ কন্যার সাথে তাকে বিয়ে দেন। এতে করে তার দরবারের অমাত্যবর্গ ও প্রজারা অত্যন্ত খুশি হয়।

কিছুকাল পর আলেপ্তগীন গজনিতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং এরপরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতা রাজ্যের অধিপতি হন এবং তার স্বপ্ন সফল হয়েছে ভেবে পুলকিতবোধ করেন। এতক্ষণ যার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তিনি আর কেউ নন, ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিত্ব সুলতান মাহমুদের পিতা সবুক্তগীন। এভাবেই সবুক্তগীনের ক্ষমতারোহনের মধ্য দিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সফল স্বপ্ন' উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন।

ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সবুক্তগীন শৈশবে ক্রীতদাসরূপে আলেপ্তগীনের নিকট বিক্রি হন। কর্মদক্ষতা ও প্রভুভক্তির কারণে তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং ক্রমেই তিনি পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আলেপ্তগীন তাকে "আমীর উল ওমরাহ" উপাধি দেন এবং তার নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি গজনির শাসকরূপে ৯৭৭-৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ও উচ্চাভিলাষী। সিংহাসনে আরোহণ করার অল্পকাল পরেই তিনি আফগানদের নিয়ে একটি দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন। এরপর খোরাসান ও সিস্তান অধিকার করে ভারত উপমহাদেশের প্রতি দৃষ্টি দেন। দীর্ঘ ২০ বৎসর তিনি কৃতিত্বের সাথে গজনি শাসন করেন। সবুক্তগীন অত্যন্ত দয়ালু এবং উদার স্বভাবের সুলতান ছিলেন। সেই সাথে ছিলেন দৃঢ়মনা ও সহিষ্ণু। তিনি ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে

মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর গজনির সিংহাসনে বসেন তার যোগ্য পুত্র জগৎ-বিখ্যাত বীর যোদ্ধা সুলতান মাহমুদ, যিনি ১৭ বার ভারত বিজয় করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তবে, মৃত্যুর পূর্বে সবুক্তগীন পুত্রের জন্য রেখে যান একটি সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সাহসী ও বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। ২০ বছর তিনি তার রাজ্য শাসন করেছেন ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে।

এ উপন্যাসে একজন সাধারণ ক্রীতদাসের নিষ্ঠা, সততা ও যোগ্যতার বলে অসাধারণ মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে লেখক ভগবৎ প্রেম ও জীবপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন হিতোপদেশের মাধ্যমে। তবে উপন্যাসে আলোচিত স্থান গজনি ও সেখানে প্রতিষ্ঠিত গজনি বংশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তিনজন ব্যক্তি এই বংশের শাসক ছিলেন :

১) আলেপ্তগীন (৯৬২-৯৭৬ খ্রি:)

২) সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৯৭ খ্রি:)

৩) সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০ খ্রি:)

৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের প্রায় আড়াইশত বৎসর পর ভারতবর্ষে মুসলমানদের দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিযান পরিচালনা করে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনির দুর্দমনীয় ও দুর্ধর্ষ তুর্কিগণ। আরবদের দ্বারা সূচিত কাজ তুর্কিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। গজনির তুর্কিদের দ্বারা বারবার ভারতবর্ষ অভিযানের কাহিনি উপমহাদেশে একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। গজনীর এই রাজবংশই সর্বপ্রথম নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে এই উপমহাদেশে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। বিশেষ করে সেনাপতি সুলতান মাহমুদ তার ৩২ বৎসরের শাসনামলে ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করে প্রত্যেকবার জয়লাভ করে ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। বাঙালির ইতিহাসবোধের উন্মেষলগ্নে বিষয় নির্বাচনকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেছেন উনিশ শতকী নবচেতনা সন্ধানী গ্রন্থ।

অঙ্গুরীয় বিনিময়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *ঐতিহাসিক উপন্যাস*-এর দ্বিতীয় আখ্যান হচ্ছে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। এ উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মুঘল ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। এটি তিনি James Hobert Caunter-এর *The Romance of History – India* গ্রন্থের 'The Mahratta Chief' অবলম্বনে রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন "ইংরেজিতে রোমান্স অব হিস্টরী নামক একখানী গ্রন্থ আছে। তাহারই

প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'স্বফল স্বপ্ন' উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসের কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৫৮)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসই কন্টারের উপন্যাস অবলম্বনে লেখা। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, কন্টারের লেখার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে স্বদেশপ্রেম, যার সন্ধান তিনি 'দি মাহ্‌রাট্টা চীফ'-এ পরিপূর্ণরূপে পেয়েছিলেন। 'ভূদেব চরিত' গ্রন্থে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে: "ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং পুষ্পাঞ্জলি ভূদেব বাবুর প্রগাঢ় স্বধর্মভক্তি, স্বদেশভক্তি এবং সাধকসুলভ ভবিষ্যৎ-দর্শনপ্রসূত। যখন 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' প্রকাশিত হইয়াছিল তখন দেশের কথা অপর কেহই ভাবিতে আরম্ভ করেন নাই" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ১৯৬)। উল্লেখ্য, এদেশে স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে যেমন সিপাহি বিপ্লব রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দিয়েছে, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-কে সেরূপ সর্বপ্রথম সাহিত্য প্রয়াস বলে সম্মান দেওয়া যেতে পারে। কেননা, স্বদেশপ্রেমের এরূপ নিদর্শন সমসাময়িক অন্য কোন রচনায় পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠেনি।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর নায়ক মহারাষ্ট্র বীর শিবাজী। মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অগাধ ভালবাসা ছিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর লিখিত স্বপ্নলব্ধ *ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এ। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তি বিজয়ী হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কী রকম হতো তিনি তারই কাল্পনিক একটি বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের দিকে ভারত উপমহাদেশের বিস্তারিত ও সঠিক ইতিহাস জানা সহজসাধ্য ছিল না। ভূদেব যে কন্টারকে অনুসরণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, সেই কন্টারও বিনয়ের সাথে স্বীকার করেছেন ঐতিহাসিক তথ্যাদির অপ্রতুলতার কথা। নিচের উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> If therefore, in the following tales, the variety should appear less than in those found in the volumes of the same work which have proceded those, the cause and consequently the excuse, must lie in the materials. ... I have, however, endeavoured to vary the materials as much as was consistant with the regime of the history. Though I sometimes found them very intractable. (The Romance of History, 1836)

হোবার্ট কন্টারের গ্রন্থের নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ইতিহাস রচনা করেননি। ইতিহাসের রোমান্স নিয়ে আখ্যান রচনা করেছেন। ভারতের ইতিহাসে যেখানে যতটুকু রোমান্স পেয়েছেন তাতেই আকৃষ্ট হয়ে তিনি তাঁর *The Romance of*

History – India রচনা করেছেন। তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এ রোমান্সের পাশাপাশি কতটুকু ইতিহাস উপস্থাপন করেছেন, মুঘল এবং শিবাজী সম্পর্কে তাঁর ধারণাই বা কী? সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি থেকেই উপলব্ধি করা যায় তার ইতিহাসচেতনার প্রকৃতি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় স্বদেশপ্রেম এবং মানবপ্রেম। লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এটিকে আখ্যায়িত করলেও কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম এবং দুই-একটি ঘটনা ছাড়া বাকি সব কাল্পনিক; শিল্পের জন্য যা অস্বাভাবিক নয়। বাদশাহজাদী রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করা এবং মারাঠা নেতা শিবাজীর সাথে বিয়ে দেওয়া ছিল আরও চমকপ্রদ। শিবাজী চরিত্রকে তিনি উপন্যাসে যেভাবে রূপদান করেছেন, ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে তার মিল সামান্যই।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময়ের ঘটনাংশ নিম্নরূপ :

দুর্গম পর্বতশ্রেণি অতিক্রম করার সময় দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেবের সপ্তদশী ও লাবণ্যময়ী কন্যা রোসিনারার বাহন দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তিনি মুঘল সেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে মাদুরা নগরীতে পিতার নিকট যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মারাঠা বীর শিবাজী কর্তৃক তিনি অপহৃত হন। সম্রাটের সাথে ছিল এই মারাঠা বীরের বৈরী সম্পর্ক। তিনি বাদশাহজাদীকে সম্মানে নিজ গুহায় বন্দী করেন।

মুঘলদের ভারত জয়ের অব্যবহিত পরে বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দু রাজপুত এবং মারাঠাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের মধ্যে মুঘল বিরোধী মনোভাবের জন্ম নেয়। এমন সময়ে শিবাজীর জন্ম। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। সেই সাথে তাঁর গুপ্তচর বাহিনীও সক্রিয় ছিল। এই গুপ্তচররা তাকে রোসিনারার আগমনের সংবাদ দেয় এবং তিনি তাকে বন্দী করেন। বন্দী অবস্থায় শিবাজীর আতিথেয়তা, মাধুর্যভাব ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধে রোসিনারা মুগ্ধ হন এবং শিবাজীর প্রতি বশীভূত হয়ে পড়েন। একদিন রোসিনারার রূপে আকৃষ্ট হয়ে মারাঠা সেন্যাধ্যক্ষ তার প্রতি অসদাচারণ করলে শিবাজী সেন্যাধ্যক্ষকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। এ সময় তিনি নিজেও আহত হন। এই ঘটনার পর শিবাজীর প্রতি রোসিনারার প্রণয়াসক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং শয্যাশায়ী শিবাজীর শয্যাপাশে থেকে তিনি দিনরাত তার সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। ফলে দুজনেই পরস্পরের প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

রোসিনারার সাথে অসদাচারণের জন্য শিবাজী যে সৈন্যাধ্যক্ষকে শায়েস্তা করেছিলেন তার বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ মুঘল সৈন্যরা অতর্কিতে শিবাজীর দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে

দুর্গ দখল ও রোসিনারাকে উদ্ধার করে, তবে শিবাজী পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। মুঘল সৈন্যরা রোসিনারাকে অতঃপর রাজমহলে প্রেরণ করেন। আওরঙ্গজেব কন্যা উদ্ধারের সংবাদে আনন্দিত হন এবং কালবিলম্ব না করে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করেন। কথা প্রসঙ্গে রোসিনারা পিতার নিকট শিবাজীর প্রশংসা করলে তিনি ক্ষুব্ধ হন। দস্যু হিসাবে যাকে জানেন নিজ কন্যার মুখে তার প্রশংসা শুনে তিনি এতটাই রেগে যান যে, কন্যার মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এমনকি তাকে বন্দী পিতা শাহাজাহানের সাথে রাখেন।

এদিকে আহত শিবাজী ভগবান রামদাস স্বামীর দুর্গে আশ্রয় নেন এবং একটু সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় নিজ দুর্গ অধিকার করার পর মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে তিনি মুঘল সৈন্যদের পরাস্ত করেন। তবে এর দীর্ঘমেয়াদী কোন সুফল না দেখে জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে পক্ষে আনার জন্য শিবাজী তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং জয়সিংহকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি যে মুঘলদের সহযোগিতা করেছেন তার ফলাফল ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। তিনি আরও বলেন যে, জয়সিংহের উচিত শিবাজীর সাথে যোগ দেওয়া। জয়সিংহ তাতে সম্মতি দেননি। জয়সিংহের পরামর্শে অবশেষে তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আওরঙ্গজেব তাকে অপমান করবে না বলে জয়সিংহ শিবাজীকে আশ্বস্ত করেন। আওরঙ্গজেবের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং রোসিনারাকে পাওয়া সহজ হবে মনে করে শিবাজী বিজয়পুর রাজ্যের রাজার বিরুদ্ধে সম্রাটকে সহযোগিতা করতে সম্মত হন। এই শর্তে যে, বিভিন্ন রাজ্যের ভূমিকরের চৌথ (চতুর্থাংশ) তাকে প্রদান করতে হবে শিবাজীর সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে। অবশেষে জয়পুরপতি শর্ত স্বীকার করে তার সাথে সন্ধি করেন।

সপ্তম অধ্যায়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্রাট শাহজাহানের প্রশংসা করেছেন এবং দিল্লি ও আগ্রায় তার স্থাপত্য কীর্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। বন্দি পিতামহের সাথে রোসিনারার নানা কথোপকথনের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে শিবাজীর সাথে রোসিনারার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে শাহজাহান তাতে সম্মতি জানান।

অন্যদিকে জয়সিংহের কথামতো শিবাজী রাজদরবারে আওরঙ্গজেবের সাথে দেখা করতে এলে কৌশলে আওরঙ্গজেব তাকে বন্দি করেন। শিবাজীও কৌশলে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। পালাবার পূর্বে রোসিনারার সাথে দেখা করে তিনি তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার আশায় এক দাসী কর্তৃক তার অঙ্গুরীয় রোসিনারার নিকট পাঠিয়ে দেন। এদিকে সম্রাট রোসিনারার সঙ্গে পারস্য রাজপুত্রের বিয়ে দেওয়ার

প্রস্তাব করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। ফলে সম্রাটও শিবাজীকে হত্যার হুমকি দেন। তবে তিনি তখনও জানতে পারেননি যে, শিবাজী পালিয়ে গেছেন। রোসিনারা শিবাজীকে ভালবেসেছিলেন এবং পালাবার সবরকম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র স্বজাতির নিকট শিবাজীর বদনাম ও অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনায় এবং ক্রুদ্ধ পিতার রোষানলে পতিত হওয়ার আশংকায় শিবাজীর অঙ্গুরীর সঙ্গে নিজ অঙ্গুরী বিনিময় করে ঐ অঙ্গুরী এবং একটি অশ্রুসিক্ত প্রণয়লিপি শিবাজীর নিকট পাঠিয়ে দেন। রামদাস স্বামী সেই পত্র পাঠ করে শোনান। রামদাস স্বামী পত্র পাঠ করে চমৎকৃত হন এবং উচ্চস্বরে বললেন– "মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতদৃশ উদারচিত্ত কামিনী আছে তাহা আমি জানিতাম না। মহারাজ, যাহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পতিব্রত রক্ষা করে তাহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা নন। মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরজন্মে এই বাদশা কন্যাই আপনার সহধর্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩৩১)। এভাবে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের কাহিনি।

অঙ্গুরীয় বিনিময়ে ভূদেব যেসব ঐতিহাসিক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা হলেন আওরঙ্গজেব, শাহজাহান, শিবাজী, রোসিনারা, জয়সিংহ ও স্বামী রামদাস। তিনি চরিত্রসমূহকে কিছুটা কাল্পনিক ও কিছুটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনে বিন্যস্ত করে ইতিহাসের অজানা মানসক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও চমকপ্রদ ঘটনার পরিণতি দেখিয়েছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেছিলেন এবং শিবাজীর সাথে মুঘলদের সংঘর্ষ বেঁধেছিল এটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। শিবাজীর যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, জয়সিংহের সাথে তার যোগাযোগ, সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার এবং রাজদরবার হতে পলায়ন সবকিছু ইতিহাস-সমর্থিত। অপরদিকে রোসিনারার গিরিসংকটে অপহরণ, শিবাজী-রোসিনারার প্রণয়, দিল্লিতে অবস্থানকালে শিবাজীর রোসিনারাকে বিয়ের প্রস্তাব এবং মহৎ আত্মবিসর্জনের প্রেরণায় তা প্রত্যাখ্যান– এ সমস্ত আবেগপ্রবণতা ও গৌরবময় দৃশ্য রচনা লেখকের কল্পনাপ্রসূত। তৎকালীন সময়ে নির্ভরযোগ্য কোনো ইতিহাস গ্রন্থ না থাকায় গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক তথ্যের স্বল্পতা আছে বটে – তবুও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এটি সার্থক। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> ভূদেব ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই প্রাণ রহস্যটি নিজ সহজ ঔচিত্যবোধ ও ইতিহাস জ্ঞানের সাহায্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি, পার্বত্য যুদ্ধ-পরিচালনা, শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা, আওরঙ্গজেবের কূটনীতি, জয়সিংহের প্রতি তাহার বিষপ্রয়োগের নির্দেশ ও তাহার পুত্রের নিকট কপট পত্র প্রেরণ প্রভৃতির ইতিহাস তথ্য তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিহাস তথ্য পরিবেশনের শিথিল গ্রন্থনের মধ্যে তিনি যে মানব চরিত্র, জ্ঞান ও জীবনসত্যের

> দৃঢ়তর গ্রন্থি সংযোজনা করিয়া আকস্মিক ঘটনাকে মনস্তত্ত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন করিয়াছেন ইহাতেই তাহার কৃতিত্ব ও মৌলিকতা। শিবাজীর চরিত্র, সৈনিকদের মধ্যে তাহার পুরস্কার বিতরণের নীতি, জাতির অভ্যুদয়কালে দেশদ্রোহীর মধ্যেও দেশাত্মবোধ ও চরিত্র-মহিমার লুপ্তাবশেষের অস্তিত্ব, স্ত্রীজাতির নৈসর্গিক সেবাপরায়ণতা ও আর্তের প্রতি মমতাবোধ, অপরাধী সেনাটিকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে রত হওয়ার মধ্যে শিবাজীর নিগূঢ় অভিপ্রায় জয়সিংহের প্রতি শিবাজীর উদারনৈতিক আবেদন, শাহজাহানের খেদপূর্ণ আত্মচিন্তন, আওঙ্গজেবের অন্তর-রহস্য উদ্‌ঘাটক স্বগতোক্তি – এই সবই তাহার মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয়। (শ্রীকুমার, ১৯৮৯ : ৩)

গল্পের নায়ক মারাঠা বীর শিবাজী হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে যে, সে সময় রাজপুত জাতির বল শৌর্য-বীর্য মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের উন্নতমস্তক মুঘলদের প্রতি নোয়ানো – এমনি অবস্থায় নব্যোত্থিত মারাঠারাই মুঘলদের সম্মুখে রুখে দাঁড়াতে এবং তাদের গর্বকে খর্ব করতে সক্ষম বলে মনে করেছেন স্বদেশ প্রেমিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে, মারাঠা জাতিই নব্য ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। হয়তো তাই তিনি মহারাষ্ট্রীয় বীর ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-ইতিহাসকে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক যে চরিত্রগুলো প্রাধান্য পেয়েছে তারা হলেন, মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব, মারাঠা নেতা শিবাজী, রোসিনারা এবং জয়পুর রাজা জয়সিংহ। এর মধ্যে তিনি আওরঙ্গজেবের চরিত্রের প্রতি খুব একটা সুবিচার করেননি। ঔপন্যাসিক সম্রাটের সাহস, ক্ষমতা, প্রতাপ কূটনৈতিক কৌশল ইত্যাদি ভালো গুণের কথা যতটুকু বলেছেন, তাঁর থেকে অধিক বলেছেন ধূর্ত, কপট, ক্রূর, গোঁড়া নীতিবাদী, বিদ্বেষী ইত্যাদি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা। কোনো কোনো জায়গায় কিছুটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন তাকে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে সম্রাটের মর্যাদাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে রোসিনারা অপহৃত হওয়ার পর সৈন্যরা কীভাবে সম্রাটকে জানাবে সে বিষয়ে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বলা হয় :

> তাহারা বাদশাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি ক্রূর প্রকৃতির ছিলেন। কোন অনুভূত পূর্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্তৃক যদি কোনো প্রযুক্তকর্ম্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষদণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুত, আওরঙ্গজেবও অন্যান্য নৃশংস স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ পরায়ণ ছিলেন – ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিৎমাত্রও জানিতেন না। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৭৪)

এই উক্তির মাধ্যমে আওরঙ্গজেবের রূঢ় চরিত্র প্রকটিত হয়েছে। আসলে কি তিনি এতটাই রূঢ় ও বদরাগী ছিলেন? ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এটা সত্য যে, মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব সম্রাট আওরঙ্গজেব। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে ভাইদের রক্তপাত এবং পিতা সম্রাট শাহজাহানকে কারাগারে বন্দী রাখার জন্য বহু লেখক তার নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনাকে লেখার উপাদান হিসেবে নিয়ে অনেক নাট্যকার আবেগময় নাটক রচনা করে জনমানসে আওরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার কথা প্রচার করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের চরিত্রের ত্রুটিগুলোকেই বেশি করে উল্লেখ করে তার অন্যান্য গুণাবলিকে ম্লান করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, আওরঙ্গজেবের চরিত্রে দোষ-গুণের সমাবেশ ছিল। শাসক হিসেবে তার যোগ্যতাও ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি যে একজন নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ও আদর্শ মুসলিম ছিলেন তা যদুনাথ সরকারের কথায়ও বর্ণিত হয়েছে –

> Auranzib had from hisboyhood cultivated control of speech and action, and tact in dealing with others. As a prince, his tact sagacity and humility made the highest nobles of his father's court his friends; and as Emperor he displayed the same qualities in a degree which would have been remarkable even in a subject. No wonder that his contemporaries called him a darvish clad in the imperial purple. (Jadunath, p. 438)

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন স্থানে আওরঙ্গজেবকে বহুবার হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন : ১ম অধ্যায়ে "বাদসাহ স্বীয় দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন এবং দূরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দুধর্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডপ্রাপ্ত হইল, তাহা বলা বাহুল্য" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৭৪)। বাদশা তার কন্যার অপহরণের কথা শুনে রাগান্বিত হতেই পারেন। কিন্তু বাহকেরা হিন্দু বলেই যে দণ্ডপ্রাপ্ত হলো এ কথার মাধ্যমে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন তাকে হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আওরঙ্গজেব অপরাধী হিন্দু সৈনিককেই শুধু শাস্তি দিয়েছেন মুসলমান সৈনিককে দেননি এমন ঘটনার উল্লেখ তার শাসনামলের কোথাও পাওয়া যায় না। অন্য জায়গায় বলেছেন, "মহারাজ"! পূর্ব্বে মুসলমান বাদশাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে করপ্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন। ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না।" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৭৪)

এখানে সম্ভবত ঔপন্যাসিক জিজিয়া কর প্রদানের কথা বলতে চেয়েছেন। জিজিয়া কোন নতুন কর (Tax) ছিল না, বরং পাঠান রাজত্বকালে এবং মোঘল রাজত্বে ও

সম্রাট আকবরের পূর্ব সময় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরকাল তা এদেশে প্রচলিত ছিল। আকবর নিজেও তার রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর এ কর গ্রহণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর পূর্বে রোমান সম্রাটগণও মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিধর্মীদের নিকট হতে Tributum Copitis বা Capitation Tax নামে গ্রহণ করতেন কার্যত যা ছিল জিজিয়ার অনুরূপ (হাবিবুর, ১৯৮৮ : ২৫২)।

জিজিয়া কর হচ্ছে অসুমলমানদের উপর ধার্যকৃত একটি কর, যা তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদায় করা হতো। জিজিয়া প্রবর্তনের পর হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ড. সাদেক আলী বলেছেন :

> When Auranzib abolished about eighty taxes no one thanked him for his generosity but when he imposed only one tax not heavy at all people began to show their displeasure. (Sadiq Ali, p. 130)

সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করার পর ৮০ প্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন। স্যার যদুনাথ সরকারের Mughal Administration গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ৬৫টির উল্লেখ রয়েছে। শেষের দুটি কর ছিল এরূপ – প্রায়াগে যে সমস্ত হিন্দু তীর্থযাত্রী গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তাহাদিগকে ছয় টাকা চারি আনা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইত। হিন্দুর চিতাভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপের জন্যও ট্যাক্স আদায় করা হইত। আওরঙ্গজেব উক্ত উভয় ট্যাক্সই রহিত করেন। ইহা তাহার সহৃদয়তা ও হিন্দুপ্রীতিরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৫৮)

এছাড়াও নানাভাবে উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই সময়ের হিন্দুদের নির্যাতনের নানা চিত্র তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা নিগৃহীত হতো। এটি কখনও বাদশাহের মুখে আবার কখনও সৈনিকদের মুখে আবার কখনও শিবাজীর মুখে বলেছেন, যেমন সৈনিকদের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কিছু তথ্য এভাবে :

১) মোগল যোদ্ধা প্রথমত ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল 'কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল, তেমনি একেবারে জাহান্নাম গিয়াছে।' (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৯১)

২) ...'তোরা কাফের, ভূতের পূজা করিস।' (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৯১)

৩) মুসলমান সৈন্য দ্বারা আহত মারাঠা সৈনিকের কাছে শিবাজী উপস্থিত হওয়ার পর – 'আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না! আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!' সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবাজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, 'অনুমান হয় দুরাত্মা মুসলমান কর্তৃক এই অন্ধকূপের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয়

নাই, অতএব তাহাই পান করিতে না কহিতেছে।' পরে কহিলেন, বোধ হয় পাপিষ্ঠরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে বুঝি তাহাই ঐ গৃহ মধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত ভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভারবহন করিবে? (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৯২)

৪) অন্য একস্থানে আহত সৈনিক বলছে, 'এই ভাবিয়া দূরাত্মা মুসলমান সেনাপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল, বলিতে পারি না বিদায় প্রদানে সম্মতি না হইয়া বিশ্বাস হন্তা বলিয়া আমার বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত।' (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৯৩)

৫) 'মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ ভাবসম্পন্ন ছিল।' (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ২৯৭)

সম্ভবত ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্যার যদুনাথ সরকার, ঈশ্বরী প্রসাদ, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যারা আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যা পুরোপুরি ইতিহাস সম্মত ছিল না। তবে আধুনিক অনেক গবেষক সেসব অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, যতখানি দোষী আওরঙ্গজেবকে করা হয় তত দোষী তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন প্রজাবৎসল শাসক। শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অসাধারণ দক্ষ আওরঙ্গজেব 'মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে রাজ্যের সর্বশ্রেণির প্রজাগণের সমবায়ে তাহার রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সৈন্য বিভাগে, রাজস্ব বিভাগে এবং অন্যান্য বিভাগে বহু বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করেন। তাহার সদ্ব্যবহারে রাজ্যের সর্বত্রই হিন্দুদিগের আন্তরিক সমর্থন তাহার রাজ্যের প্রতি ছিল।..... প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই মুসলমান সেনাপতিগণের সহিত হিন্দু সেনাপতিগণ বিশ্বস্ততার সহিত আওরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। সোমগড়ের ভীষণ সংগ্রামে দারাশিকোর বিরুদ্ধে মুসলমান সেনাপতিগণের পার্শ্বে আমরা চম্পত রাও, ভগবান সিংহ হাজা, ইন্দ্রদুন্ন এই তিনজন হিন্দু সেনাপতি, বাঙালায় সুলতান সুজার বিরুদ্ধে খাজোয়ার সমরক্ষেত্রে সেনাপতি রাজা সুজান সিংহ এবং রাম সিংহ আওরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তিনি জয়সিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতিগণকে যৌথ দায়িত্ব দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কার্যে প্রেরণ করিতেন।' (শেখ হাবিবুর, ১৯৮৮ : ৩৫)

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন খাটি মুসলমান ও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে রাজ্য শাসনকল্পে ইসলাম ধর্মানুমোদিত কয়েকটি বিধান জারি করেন। সম্রাট স্বয়ং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আইন-কানুন পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতেন। দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, ধর্মহীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হতে

তিনি সাম্রাজ্যকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। একজন নিষ্ঠাবান শাসক ধার্মিক ও আদর্শ মুসলিম হিসাবে তিনি 'জিন্দাপীর' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে R. C. Majumdar বলেন,

> His private life was marked by a high standard of morality, and he scrupulously abstained from the common vices of his time. Thus he was regarded by his contemporaries as a 'darvish born in the purple' and the Muslims venerated him as a "Zinda Pir or living saint. (Majumdar, p. 489)

সম্রাট আওরঙ্গজেব সামাজিক ও নৈতিক দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ কল্পেও আইন জারি করেন। হিন্দুদের সমাজের প্রচলিত সতীদাহ প্রথাও তিনি রহিত করেন। এছাড়া সিংহাসনে আরোহণের পর পরই প্রজাদের কল্যাণের জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব ৮০ প্রকার কর ও শুল্ক রহিত করেন। এর মধ্যে বেশ কিছু কর হিন্দুদের দিতে হতো। তাঁর নৈতিক সাহস ছিল দুর্জয়, যার জন্য তিনি ঘোষিত বিধানসমূহ কার্যকর করতে পেরেছিলেন। এই বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্তনের কারণে ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে ভারতের সকল মুঘল সম্রাট অপেক্ষা আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে অধিক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি তাঁর বিরোধিতাকারী ঐতিহাসিকগণ সম্রাটের নামে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১. হিন্দু মন্দির ও টোল ধ্বংস, ২. হিন্দু কর্মচারীদের পদচ্যুতি ও ৩. হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে সবার নিকট সমাদৃত ছিলেন। মন্দির ধ্বংসের যে অভিযোগ করা হয় তা থেকে সুলতান মাহমুদও রেহাই পাননি। উভয়েই যদি মন্দির ধ্বংসের মত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত থাকতেন তাহলে অদ্যাবধি কোন মন্দিরই ভারতবর্ষের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করত না। দিল্লি, আগ্রা, বেনারস ও গুজরাটসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু মন্দির আজও কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে – যা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তবে সম্রাটের এক ফরমানে দেখা যায় যে, তিনি প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন এবং নতুন মন্দির তৈরি না করতে বলেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো এমন কিছু মন্দির ধ্বংস করা হয়, যা সম্রাট আকবরের সময়ও করা হয়েছিল। নিচের উক্তিতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় –

> তাহার সময়ে বিনা কারণে শুধু ধর্মীয় কারণে কোন মন্দির ধ্বংস করা হয় নাই। ধর্ম মন্দিরে রাজদ্রোহ ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলিত বলিয়া অনেক মন্দির ধ্বংস করা রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য সম্রাট কখনো উদগ্রীব হইয়া উঠেন নাই। আলেকজান্ডার হ্যামিলটন-এর মতে আওরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন এবং

> নিজ নিজ ধর্ম পালন করিতে পারিত। কাহারো ধর্ম স্বাধীনতা খর্ব করা হয় নাই। (আবদুল আলীম, পৃ. ২৭৬)

অন্যত্র এ সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> আওরঙ্গজেব ঘোষণা করেন যে, "ইসলামে শরিয়ত অনুযায়ী আমরা আদেশ দিয়েছি যে, হিন্দুগণের মন্দির ও প্রতিমা পূজার অধিকার থাকিবে এবং আমাদের আশ্রয়প্রাপ্ত হইবে..... আমরা আদেশ করিতেছি যে, এই আদেশে বাণী প্রচারের তারিখ হইতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি কোন পূঁজা বিষয়ে অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমাদের প্রজাগণ সুখ-শান্তিতে বাস করুক এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করুক। (Islamic Review, 1925: 125)

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং আওরঙ্গজেবের আমলেও সেই মৈত্রী সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়নি। তিনি আরও বলেছেন –

> মুঘল আমলে অবশ্য বহু হিন্দু ধর্মত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু যতদূর জানা যায় এই কারণে উভয় পক্ষে কোন শত্রুতার ভাব জেগে উঠেনি। ইসলাম ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত বলে নিম্নবর্ণের বঞ্চিত হিন্দুদের কাছে তার একটা বিশিষ্ট আবেদনও ছিল। (হীরেন্দ্রনাথ, ১৯৮৩ : ২)

হিন্দু কর্মচারীদের বরখাস্ত করার অভিযোগও সত্য নয়। তবে একথা সত্য যে, কেবল কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ হিন্দু কেরানি দেওয়ান রাজস্ব আদায়কারীকে শাসন বিভাগের নিরাপত্তার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার শাসনামলে সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিভাগে বহু হিন্দু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এ সময় উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারীর সংখ্যা সম্রাট আকবরের সময়ের সংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল। সম্রাট আকবর হিন্দুদের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ শাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সেই সম্রাট আকবরের সময় সরকারি কার্যে শতকরা ১৩ জন অমুসলমান নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তাদের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা ২০ ভাগ। ৫৩৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ১০৪ জনই ছিলেন হিন্দু। রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ, ইন্দ্রসিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রমুখ হিন্দু রাজকর্মচারীগণ এ সময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়া অনেক রাজপুত রাজা হিন্দুদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের পক্ষে সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন। কাজেই সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দু কর্মচারীদের বিনা অপরাধে পদচ্যুত করেছিলেন এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন। মুসলমান শাসনাধীনে অমুসলিম প্রজার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য জিজিয়া কর ধার্য করা হয়। সম্রাট আকবর এ কর উঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক

শ্রেণিকে সামরিক কাজে নিয়োগ করেছিলেন। অমুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক কাজে নিযুক্ত করার বিষয়টি সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে আইনসঙ্গত মনে হয়নি এবং এজন্য তিনি জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণ, নারী, শিশু, উন্মাদ ও বৃদ্ধদেরকে এই কর দিতে হতো না। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমালোচকরা জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের মধ্যে সম্রাটের ধর্মান্ধতা লক্ষ করেছেন। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সিংহাসনে আরোহণের ২১ বছর পর (১৬৭৯ খ্রি.) তিনি জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। কারণ বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ফলে এবং প্রায় ৮০ প্রকারের বাড়তি কর উঠিয়ে দেওয়ায় রাজকোষে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। যদি তিনি ধর্মান্ধতাবশত এ কাজ করতেন তাহলে দীর্ঘ একুশ বছর অপেক্ষা করার কোনো কারণ ছিল না। কাজেই একথা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব কোনো ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন (আবদুল আলীম, ২৭৬-২৭৭)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও মাঝে মাঝে আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন –

> আওরঙ্গজেব কখনই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন না, 'অতএব' তাহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে সেরূপ বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিককাল আমোদ-প্রমোদ করিতেন না। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩১৪)

আবার প্রশংসামূলক কথাও বলেছেন –

> আওরঙ্গজেব বাস্তবিক কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন এবং দৈনিক কার্য সমুদয় সমাধান না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনি সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর ওম্রা প্রভৃতি সকলে তাহার কার্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমখাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসলখানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালতখানায় গিয়া কীরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব স্ব নিয়োজিত কার্যে মনোযোগী আছে কিনা দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কুচকাওয়াজ দেখিয়া কাহারও বা বেতন বৃদ্ধি কাহারও বা কর্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এরূপে তাহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটি নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সে স্থান হইতেই নির্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতেন না। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩১৪)

এভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের একটি কর্মব্যস্ত দিনের চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে তিনি সম্রাট শাহজাহানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মুঘল স্থাপত্য শিল্পের প্রশংসা করতে গিয়ে ভূদেব বার বার শাহজাহানের দিল্লি-আগ্রার কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সাধারণভাবে বাদশাহের গুণগান করেছেন। ভূদেবের ভাষায় "যে সকল পর্যটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদশাদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়নগোচর করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভাবিহীন হইয়াছিল বলিয়া আওরঙ্গজেবের পিতা শাহজাহান সমুদয় নগরটি নতুন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাহজাহানবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল! তন্মধ্যে এবং উভয়দিকে কেমন পরিপাটিরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটিকে শোভাময় এবং সুখপ্রদ করিয়াছিল। এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলন্ডীয় সম্রাটদিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর। বিশেষতঃ শ্বেত মারবেলে নির্ম্মিত মসজীদটির শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকার বেষ্টিত এবং বহুমূল্য মারবেল প্রস্তরে অতি পরিপাটিরূপে নির্ম্মিত। মুসলমানেরা যে হস্তশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্ম্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্যটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্ম্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমনুষ্যত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ শাহজাহান ভূপাল কর্তৃক নির্ম্মিত আগ্রা নগরীস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজমহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্ম্মাণ কীর্ত্তির অসাধারণ দৃষ্টান্তস্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশমণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকাস্তবকখচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজমহলও সেরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ শাহজাহান নির্ম্মিত 'ময়ূরতক্ত' নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব? সেই রাজাসন দুটি দিব্য-গঠন ধাতুনির্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণিমাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদয় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।" এই জগদ্বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনের অন্য আর এক স্থানে খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই মুহূর্তে আওরঙ্গজেব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং শিবাজী সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের জন্য দরবারে প্রবেশ করেন। "তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুচ্চ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে, অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।" (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩০৭)

এভাবে শাহজাহানের কৃতিত্বকে তুলে ধরেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসে। এটি সম্রাট শাহজাহানের প্রতি তার দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক কারণে আওরঙ্গজেব পিতা সম্রাট শাহজাহানের কারাবন্দী করাকে তিনি ভালো চোখে দেখেননি। এ বিষয়টি তিনি তার লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নিচের ভাষ্যে সেই সত্যটিই উপলব্ধ হয়েছে মর্মে মর্মে –

> যে শাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদসকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি এক্ষণে কোথায়? .... তাহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঙ্গেব কর্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! শাহজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা কোন দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্য্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু! প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়। বৃদ্ধ বাদসাহ শাহজাহান, দুষ্ট পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক অপহৃত-সর্ব্বস্থ হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ-নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩০৭)

সম্রাট শাহজাহানের গৌরবময় রাজত্বকালের শেষ দিকে পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবে এ ঘটনার জন্য শুধু এককভাবে আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন না। এ সম্পর্কে R. C. Majumder বলেছেন –

> In this, he was simply following the example that had become almost traditional in the Timurid Family in India. It would be unjust to throw on him the entire responsibility for the war of succession; it would have come at any rate, as none of the brothers was willing to make any compromise. It should not be forgotten that while Shah Jahan removed all his possible rivals Aurangazeb did not put to death all his nephews. It is indeed hard to defend Aurangazeb's harsh treatment of his old father, but in justice to him it should be noted that at least he was not a parricide of which we find numerous instances in the history of India and of other countries. (Majumdar, p. 501)

সর্বোপরি, এ ঘটনা ঘটেছিল মধ্যযুগে (১৬৫৭ খ্রি.)। সে যুগে ক্ষমতা দখলের জন্য ভ্রাতৃহত্যা কেন, পিতৃহত্যাও ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ছিল না। আর ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসটি লিখেছেন আধুনিক যুগে। সুতরাং তার দৃষ্টিতে সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসন দখলের পশ্চাতের ঘটনাগুলি অত্যন্ত নির্মম এবং অস্বাভাবিকও বটে। কিন্তু আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, স্থান ও সময়ের ব্যবধানে ন্যায় ও অন্যায়ের সংজ্ঞা বদলে যায়, যা আজকের দৃষ্টিতে অন্যায়, সেদিন তা ছিল ন্যায়সঙ্গত। তবে এই নিষ্ঠুরতার জন্য একমাত্র আওরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন, একথা বললে তার প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। এক্ষেত্রে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে।

> শাহজাহানের মৃত্যুর পূর্বেই সিংহাসনলোলুপ পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে আওরঙ্গজেবের ভূমিকাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুঘল পরিবারে যে পরম্পরা চলে এসেছিল, তদানীন্তনকালে সিংহাসনের লোভে যে পরস্পর দ্বেষ ও হিংসা অপ্রত্যাশিত ছিল না, তা ভুলে গেলে চলবে না। সবচেয়ে নতুন এবং সবচেয়ে কর্মক্ষম বলেই আওরঙ্গজেব তখন জয়ী হয়েছিলেন; ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতিরও কোন আশা ছিল না, উদারচেতা এবং অধ্যয়নপ্রিয় হয়েও দারা শুকো পর্যন্ত যুদ্ধ না করে পারেননি, আর যুদ্ধ একবার বাধলে ন্যায়-অন্যায়বোধ অন্ততঃ সাময়িকভাবে যেন স্থগিত থাকে। শাহজাহান প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যারা সম্ভাবনা রাখত তাদের সকলকে হত্যা করেছিলেন, সে তুলনায় আওরঙ্গজেবের পক্ষে দাবি করা চলে যে, প্রত্যেকটি ভ্রাতৃষ্পুত্রের প্রাণহরণ তিনি করেননি। পিতাকে বন্দী করে যন্ত্রণা দেওয়ার অপরাধে অবশ্যই আওরঙ্গজেবকে অভিযুক্ত করা যায়, কিন্তু সর্বদেশে রাজপরিবারে পিতৃহত্যাদের যে উদাহরণ মেলে, আওরঙ্গজেবকে অন্তত তাদের মধ্যে ফেলা যায় না। (হীরেন্দ্রনাথ, ১৯৮৩ : ১২)

অঙ্গুরীর বিনিময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরের ঐতিহাসিক চরিত্রটি মারাঠা নেতা শিবাজীর। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যাকে স্বদেশপ্রেমিক ও বীরযোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তিনি স্বাধীন 'মহারাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তিশালী মুঘলদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন বহুবার। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আওরঙ্গজেবের কন্যা রওশনারাকে অপহরণ করেন, তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। পরবর্তী সময়ে শিবাজী রওশনারার প্রেমে পড়েন যদিও তাঁর সফল পরিণতি ঘটেনি – উপন্যাসে এমনটি বর্ণিত আছে। উপন্যাসের নায়ক শিবাজী ও নায়িকা আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারা। মুঘল ইতিহাসের আধারে এক কাল্পনিক বিষয়ের উপস্থাপনা। কারণ রওশনারা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা ছিল না বরং বোন ছিল। আর কোন মুঘল কন্যার সাথে শিবাজীর প্রেম ছিল এমনটি কখনও শোনা যায়নি।

শিবাজী চরিত্রে তার অন্তরের সত্যিকার প্রেম ও বাইরে স্বদেশ প্রেম পাশাপাশি সমান্তরাল রেখায় অগ্রসর হয়েছে। একাধারে তাকে একজন বীর যোদ্ধা, প্রেমিক ও স্বদেশ প্রেমিক অর্থাৎ সব রকম মানবিক গুণে গুণান্বিত করে উপন্যাস চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। অপরদিকে মুসলমান সৈন্যদের নির্যাতিত ও ধ্বংসকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। বস্তুত, শিবাজী ততটা নিষ্কলুষ ছিলেন না যতটা তাকে উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সর্বোপরি মুসলিম রাজ্যের একজন সামান্য জায়গিরদারের পুত্র হয়ে নিজ শ্রম, অধ্যবসায়, সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও দক্ষতা বলে তিনি একজন শক্তিশালী রাজার মর্যাদায় উন্নীত হন এবং মুঘলদের বিরোধিতার মধ্যেও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী দুঃসাহসিকতার জন্য খ্যাত ছিলেন, তবে তার সামরিক জীবনের সূচনা হয় লুটতরাজের মধ্য দিয়ে। ১৬৬৫ সালে তিনি সুরাট দুর্গ লুণ্ঠন করেন, এমনকি তীর্থ যাত্রীদের জাহাজও তিনি লুণ্ঠন করেন।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসী মারাঠা নেতা ছিলেন শিবাজী। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে (হীরেন্দ্রনাথের মতে ১৬২৯/১৬৩০) শিবনার দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শিবাজীর মাতার নাম জিজাবাই ও পিতার নাম শাহজী ভোঁসলে – যিনি কর্ণাটকের জায়গীর ছিলেন। শিবাজীর পিতা তুকাবাঙ্গা নামে একজন মহিলাকে বিয়ে করার ফলে পুত্র শিবাজী ও পত্নী জিজাবাইয়ের প্রতি সদয় ছিলেন না। মা ও ছেলে উভয়েই দাদাজী খণ্ডদেবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। জিজাবাই ছিলেন গুণবতী, বুদ্ধিমতী ও ধর্মপরায়ণা মহিলা। শিবাজী তার মা ও ধর্মগুরু রামদাসের মাধ্যমে গোঁড়া হিন্দুধর্মের সাথে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাননি, তবে মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত হিন্দু বীরদের গল্প শুনে অল্প বয়স হতেই বীর হবার বাসনা জাগ্রত হয়। গুরু রামদাস তাকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। এর উল্লেখ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এ আছে। রামদাস গুরুর কাছে তিনি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবাজী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন মুঘলদের বিরুদ্ধে এবং পর্যুদস্ত করে তুলেছিলেন মুঘল শাসনকে। শিবাজীকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব একে একে পাঠিয়েছিলেন শায়েস্তা খান ও রাজা জয়সিংহকে। জয়সিংহের মাধ্যমে তিনি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন কিছুদিনের জন্য। যদিও পরে তিনি আবার সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন সামরিক দক্ষতার বলে এটি যেমন সত্য, আবার কোনো কোনো সময় জয়লাভ করেছেন কপটতার আশ্রয় নিয়ে এটিও তেমন সত্য। তবে শিবাজী মোটামুটি সফল হয়েছিলেন বলা যায়, কেননা তিনি বিচ্ছিন্ন মারাঠাদের একটি গৌরবময় জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুসলমানরা ভারতবর্ষে ছিল বহিরাগত। তাই হিন্দুস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায় সবসময় চেয়েছে তাদের বিতাড়িত করতে। তারই ধারাবাহিকতায় শিবাজীর উত্থান এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতিকে নিয়ে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। বস্তুত, মারাঠাদের সংগ্রাম ছিল স্বদেশরক্ষা আর মুঘলদের লক্ষ ছিল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ।

এরপর *অঙ্গুরীয় বিনিময়* উপন্যাসে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন জয়পুরের প্রদেশাধিপতি রাজপুত রাজা জয়সিংহ। যে কয়জন রাজপুত রাজা মুঘলদের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করেছেন তার মধ্যে একজন হলেন রাজা জয়সিংহ। আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিদ্রোহ দমনে জয়সিংহকে নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি তাতে খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। তিনি শিবাজীকে বুঝিয়ে রাজদরবারে এনে সন্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা

উপন্যাসে উল্লেখ আছে। তবে তাকে হত্যা করার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সত্যতা পাওয়া যায় না। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে বুরহানপুরে জয়সিংহ মৃত্যুবরণ করেন।

অঙ্গুরীয় বিনিময় উপন্যাসে নায়িকা চরিত্র রোসিনারা। উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটানা প্রেমানুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। ভূদেবের কল্পনার রোসিনারা মানবিক প্রেমের প্রদীপ হাতে বর্তমানের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত। প্রেমের ঐশ্বর্য ও অনির্বাণ দ্বীপ-শিখার কাছে জাতি-ধর্ম-নীতিজ্ঞান তুচ্ছ। রোসিনারা মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যাই হোক; কিংবা রাজপুত জাতির প্রতাপ সিংহের দুহিতাই হোক তা আমাদের কাছে বড় কথা নয়। রোসিনারার বড় পরিচয় সে মানবকন্যা, ভূদেবের মানস-কন্যা। রোসিনারার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমবোধ ইতিহাসের একটি শক্তিশালী চরিত্রের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখককে শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে শিল্প সৌকর্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রের মানবিক দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা, দ্বিধা, সংঘাত সবই রোসিনারার মধ্যে বিদ্যমান। প্রথমত, তার চরিত্রে দুটি দিক ফুটে উঠেছে, একটি আভিজাত্যের অহংকার, অন্যটি নারীত্বের পরিচয়। একটি বিসর্জন দিয়ে অন্যটির প্রতিষ্ঠা ঘটালে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা রক্ষা পায় না। ভূদেব এ বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলেছেন (দিলওয়ার হোসেন, ১৯৮৪ : ১২৪-১২৫)। এভাবেই উপন্যাসে রোসিনারার চরিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক, যেখানে তিনি একজন আত্মত্যাগী নারী। ত্যাগেও যে প্রেম মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠে তার জীবনাদর্শ দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। বলা যায়, রোসিনারা চরিত্রটি ভূদেবের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। তবে রোসিনারাকে আওরঙ্গজেবের কন্যারূপে কল্পনা করে উপন্যাসে যে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হয়েছে বাস্তব ঘটনা তা নয়। ইতিহাসে যে রওশন আরার পরিচয় পাওয়া যায় তিনি সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় কন্যা ও আওরঙ্গজেবের ভগিনী। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আওরঙ্গজেবের সন্তানদের মধ্যে রোসিনারা নামে কোনো কন্যা ছিল না। নিম্নবর্ণিত আওরঙ্গজেব স্ত্রী-পুত্র-কন্যার তালিকা থেকে তা প্রমাণিত হবে :

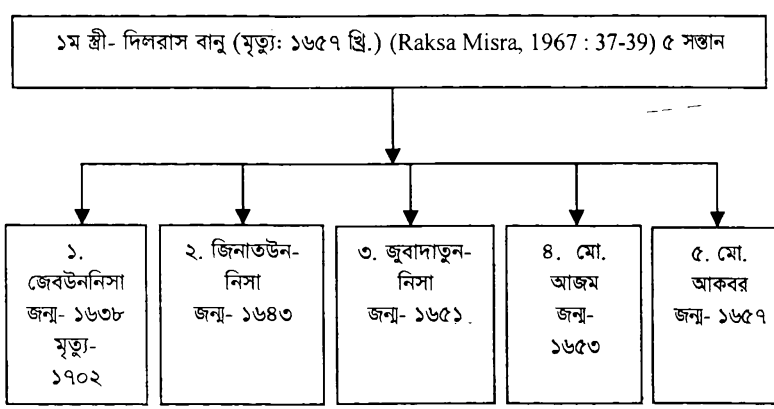

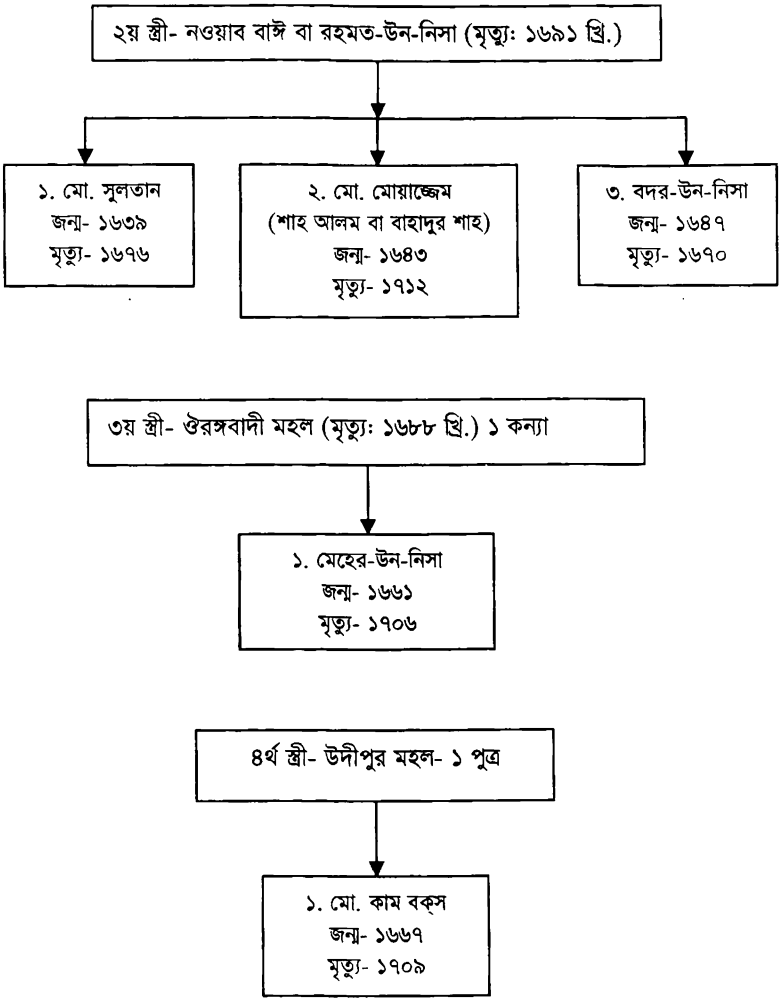

৫ম স্ত্রী জয়নাবদি (হিরা বাঈ) এবং

৬ষ্ঠ স্ত্রী দিরারামের কোনো সন্তান ছিল না।

সম্রাট আওরঙ্গজেব পুত্র-কন্যার তালিকার পাশাপাশি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র-কন্যার নামের তালিকা লক্ষ করলে রওশন আরার অবস্থান বোঝা যাবে। মানুচীর মতে, শাহজাহানের চার পুত্র ও তিন কন্যা ছিল।

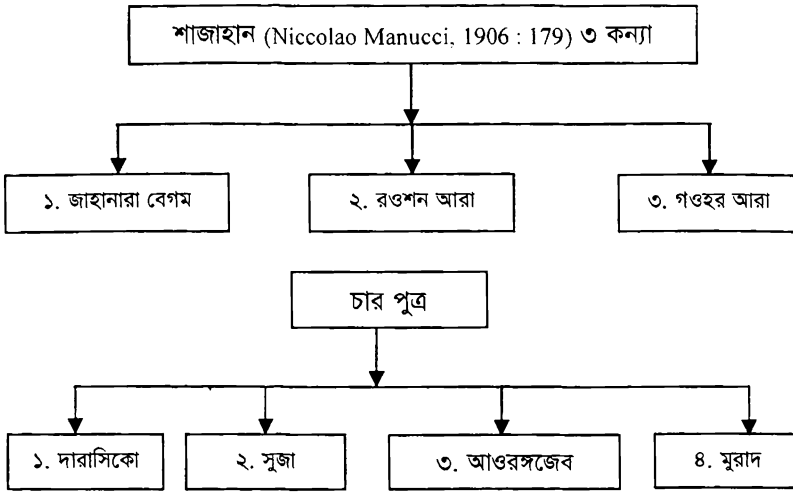

William Irvine নিকোলা মানুচীর (Niccolao Manucci [1639–1717]) *Storia do Mogor* সম্পাদনাকালে পাদটীকায় শাহজাহানের চার কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বেগম সাহিবকে জাহানারা হিসেবে মনে করেছেন।

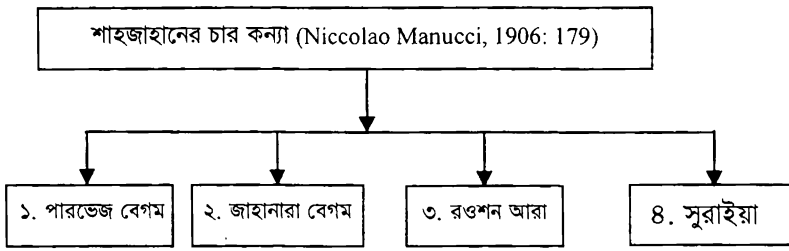

Stanly Lane Poole তার Aurangzib গ্রন্থে Sir William Wilson Hunter এর *Rulers of India*-এর উপর নির্ভর করে শাজাহানের পুত্র-কন্যার তালিকা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন :

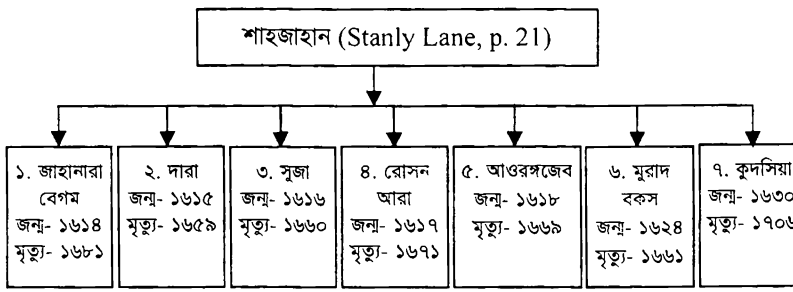

আওরঙ্গজেব ও শাহজাহানের পুত্র-কন্যাদের তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রওশন আরা আওরঙ্গজেবের কন্যা নয়, ভগিনী এবং শাহজাহানের কন্যা। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্টারের লেখা বই The Romance of History – India-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লিখেছেন বলে স্বীকার করেছেন। কন্টারের বইয়ে রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভগিনী হিসেবে রওশন আরা আওরঙ্গজেবের খুব প্রিয় ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান যখন আওরঙ্গজেবকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, রওশন আরার মাধ্যমে রাজদরবারের যত গোপন খবর তখন আওরঙ্গজেব জেনে নিতেন। রওশন আরাও ভাই আওরঙ্গজেবের অতি ভক্ত ছিলেন।

ভ্রাতৃ-ভগিনীর এই স্নেহ-শ্রদ্ধা সম্পর্ক ও পক্ষপাতিত্ববোধ দেখে কন্টার রওশন আরাকে আওরঙ্গজেবের কন্যা বলে ভুল করেছেন কি? নাকি নিছক রোমান্স সৃষ্টির জন্য তা করেছেন তা বলা দুষ্কর। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্টারকে অনুসরণ করেছেন হয়ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের অপ্রতুলতার কারণে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' যতখানি ঐতিহাসিক, তার চেয়ে বেশি শিবাজীর স্বদেশপ্রেম ও রোসিনারার প্রেমকাহিনি।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ঔপন্যাসিক উদীয়মান মারাঠা জাতির বীর পুরুষ শিবাজীকে গল্পের নায়ক করেছেন। কারণ তার ধারণা ছিল যে, একমাত্র মারাঠারাই নবভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। ভূদেবকে মারাঠা বীর আকৃষ্ট করার আরো কারণ হচ্ছে, সেকালে হিন্দু ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ মারাঠাদের মধ্যে প্রবল ছিল এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিবাজীর মধ্যে সেই স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল লক্ষণীয়। কাহিনি আবর্তিত হয়েছে শিবাজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আদর্শ রণকৌশল ও নীতির বর্ণনাকে কেন্দ্র করে। মোট কথা, শিবাজীকে তিনি আদর্শবানদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপন করেছেন। ঊনিশ শতকের যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছিল ভূদেবের মধ্যে, তা তিনি শিবাজীর চরিত্রাঙ্কনে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে জয়সিংহ ও শিবাজীর কথোপকথন এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> মহারাজ! আমাদিগের একত্রে মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা হয়; দেশের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং অন্য সর্ব্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন। যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা-কর্তৃক হ্রস্বতেজা হয়েন, উভয়ই আরঞ্জেবের মঙ্গলাবহ। (প্রদোষ কুমার, ১৩৬৪ : ৩০২)

দেশের মুখ উজ্জ্বল করা এবং জাতীয় ধর্ম রক্ষা করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র অপর এক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন বিজিত কুমার দত্ত :

> আগে যে সমস্ত ঐতিহাসিক গাল-গল্প পেয়েছি সেখানে রোমান্স, কিংবা যুদ্ধ বর্ণনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইতিহাসের ক্ষীণ পদধ্বনি মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কাহিনীটি ইতিবৃত্তমূলক। ভূদেবের *অঙ্গুরীয় বিনিময়ে* রোমান্স অংশ ততটা প্রাধান্য পায়নি সত্য, কিন্তু সমস্ত কাহিনী জুড়ে একটি ঐতিহাসিক আবহ রয়েছে। শিবাজীর পার্বত্য দুর্গের বর্ণনায় মারাঠাদের সাহসিকতায় যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনায় রাজ-অন্তঃপুরের চকিত উদ্‌ঘাটনে শাহজাহানের করুণ জীবনী প্রকাশে, বাদশাহজাদীর ট্রাজিক অবস্থায় আওরঙ্গজেবের শঠতা ক্রূরতার বর্ণনাতে ভূদেব ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলটি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অথচ তথ্য কোথাও আত্যন্তিক হয়ে দেখা দেয়নি। সর্বত্রই এই কাহিনীর গতি সাবলীল – যা ঘটেনি অথচ সম্ভব ছিল সেই সত্য উদ্‌ঘাটনে ভূদেব যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাস কাহিনীটির কেন্দ্রবিন্দুতে আর রোমান্স ইতিহাসের চারদিকে একটা সরু পাড় বুনে দিয়ে নবতর বৈচিত্র্যের সূচনা করেছে। (বিজিত কুমার, ১৩৬৯ : ৪৭)

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঔপন্যাসিক অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সময়ের একটি আধুনিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন –

> প্রেম এবং বিধর্মিতা একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মগত বিজাতীয়তার দ্বন্দ্ব উপন্যাস কাহিনীর অন্তর-বাইরে যুগপৎ প্রকট হয়েছে। বহিরঙ্গে এই দ্বন্দ্বের উৎস শিবাজী ঔরঙ্গজীবের রাষ্ট্র-বৈরী। অন্তরঙ্গে আছে পিতৃশত্রু – হিন্দু-রাজার প্রতি রোসিনারার ক্রম অনুরাগ সঞ্চারের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার গ্রন্থি-মোচন। নারীর স্বয়ং-স্বতন্ত্র প্রণয়াধিকার ও সমাজ-পটভূমির বিরোধিতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনীতে উনিশ শতকের জাগ্রত জীবন দ্বন্দ্বে গতিবেগ সঞ্চারিত করেছে। গল্পের যেমন উপন্যাসোচিত পরিণতি বোধ ও সমস্যা সচেতনতা রয়েছে তেমনি তার পরিণতি নির্দেশে আছে দুর্বল হলেও অখণ্ড জীবনবোধের নিশ্চিত প্রেরণা। (ভূদেব চৌধুরী, পৃ. ৩২)

Hobert Caunter রচিত *The Romance of History – India* গ্রন্থের 'The Mahratta Chief'-এর ঘটনাংশ অনুকরণে ভূদেব মুখোপাধ্যায় *অঙ্গুরীয় বিনিময়* উপন্যাসটির কাহিনির বিন্যাস ঘটালেও কন্টারের অনেক অংশই বাদ দিয়েছেন। কন্টার যদিও রোমান্সকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রূপদান করেছেন, সেখানে ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে খুব সামান্যই। তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই রোমান্সের সাথে ইতিহাসের তথ্য ও সত্যের সংমিশ্রণে নতুনত্ব আনার প্রয়াস পেয়েছেন। কন্টার শিবাজী-রোসিনারার বিয়ে দিয়েছেন কিন্তু ভূদেবের গ্রন্থে শিবাজী-রোসিনারার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এটা তার উদ্দেশ্যও ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল মূলত,

শিবাজীর স্বদেশ প্রেমকে তুলে ধরা। সেই সাথে নব্য অভ্যুত্থানকৃত ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতির ইতিহাস বর্ণনা করা। ভূদেব শিবাজীর স্বদেশপ্রেমের প্রেরণাদাতা রামদাস স্বামীকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। আবার মুঘল কারাগারের রোসিনারার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের পিতা সম্রাট শাহজাহানের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তবে কন্টারে এসব বিষয়ের উল্লেখ নেই। দুটি কারণে ভূদেব শাহজাহানের আবির্ভাব ঘটিয়ে থাকতে পারেন। "প্রথমত, এতবড় মুঘল বাদশা বৃদ্ধ পিতার প্রতি পুত্রের অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শনের ও প্রচারের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়ত, শিবাজীর প্রতি রোসিনারার গভীর মানবিক প্রণয়বোধের প্রশ্নে শাহজাহান বাদশার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানানো" (দিলওয়ার হোসেন, ১৯৮৪)। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের স্বল্পতা থাকলেও তিনি যা করতে চেয়েছেন তা হলো ইংরেজ শাসিত পরাধীন দেশে মুঘলকে ইংরেজের প্রতীক করে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির ঐক্যের ভিতর দিয়ে এদেশে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

দিলওয়ার হোসেনের মতে, "বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা তার বিচার অবশ্যই আবশ্যক। কিন্তু একথাও সত্য যে, শিবাজীর স্বদেশ প্রেম এবং রোসিনারার মানবিক প্রেম সে যুগের বড় ইতিহাস। কাজেই কন্টারকে অনুসরণ করা ভূদেবের পক্ষে একটি উপলক্ষ্য মাত্র। প্রয়োজনমত মুঘল ইতিহাসকে ব্যবহার করাটাও একটা উপলক্ষ্য মাত্র। মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঐ 'ভবানীর বরপুত্র' শিবাজীকে অঙ্কন করা নিজের মানস-কন্যা রোসিনারাকে সৃষ্টি করা" (দিলওয়ার হোসেন, ১৯৮৪ : ১৩১)। অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সুবিধা-অসুবিধা এবং ত্রুটি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আমাদের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কুহেলিকাময় সত্য কল্পনাজড়িত আকাশ-বাতাসের মধ্যে এই নিগূঢ় ঐক্যের সন্ধান একেবারেই মিলে না। ইহাদের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবাস্তব রকমের; ইতিহাস কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য হইতে মুক্তিলাভের একটা উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে – কেবল অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বাহুল্যের অবসর দিয়াছে মাত্র। ইহারা প্রকৃত ইতিহাসও নয় প্রকৃত উপন্যাসও নয়। আমাদের দেশে প্রকৃত ইতিহাস রচনা কোনকালে ছিল না, অতীত যুগের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন। অতীত যুগের মানুষের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, আমাদের সঙ্গে তাহাদের আচার-ব্যবহার আমোদ-প্রমোদের প্রভেদ ইত্যাদি বিষয়ের কোন প্রকার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের ঐতিহাসিকদের নাই, ঔপন্যাসিকদের তো কথাই নাই। অতীতের মানুষ যে আমাদেরই মত রক্ত-মাংসের জীব, আমাদের মত তাহাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত বাস্তব জীবন ছিল। তাহারা যে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বে নিমগ্ন থাকিয়া স্বপ্নময় জীবন অতিবাহিত করিত না আমাদেরই মত তাহাদের জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধী ভাবের আলোড়ন ছিল, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে

পারি নাই। সুতরাং অতীতের দিকে যাত্রা আমাদের পক্ষে একটি নিতান্ত স্বপ্ন প্রয়াণ বা অন্ধকারের মধ্যে লম্ফ প্রদানের মতই হইয়াছে। ইতিহাসের সহিত বাস্তব জীবনের একটা অন্তরঙ্গ মিলনের সংঘটন করাও ঔপন্যাসিকদের কলাকুশলতার অতীত ছিল। সুতরাং সব দিক দিয়াই ভূদেবের রচনা ব্যতীত এই প্রথম যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে নিতান্তই ব্যর্থ প্রয়াসের নিদর্শন বলিয়া ধরিতে হইবে" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯ : ৩৭-৩৮)।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি প্রথমে রমেশচন্দ্র দত্ত ও পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন বিশেষ করে শিবাজীর পার্বত্য-যুদ্ধ বর্ণনা ও জয়সিংহের নিকট তার উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেমের আবেদনের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও এর কিঞ্চিৎ প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন ভূদেবের রামদাস স্বামীর অনুসরণে দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, আবার রোসিনারার সঙ্গে আয়েষারও কিছু মিল রয়েছে। এই দুটি বিষয়ই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের প্রধান উপাদান।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঊনিশ শতকীয় ইতিহাসচেতনার মূল ধারার সূত্রপাত করেন বাংলা উপন্যাসে। ধর্মাবেগের সঙ্গে দেশপ্রেমের মিশ্রণে জাতীয়তাবাদের যে বোধ সৃষ্টি হল, সেখানে আত্মসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কারের একটা আধ্যাত্মিক সূত্রও পেয়ে গেল ঊনিশ শতকের বাঙালি পাঠক। ঔপনিবেশিক সমাজ-বাস্তবতায় রেনেসাঁসের বোধসমূহ এই জটিল ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিল। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামকরণের মধ্যেও রয়ে গেছে ঊনিশ শতকী ইতিহাসচেতনার দ্ব্যর্থতাবোধক চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৭)। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা

এ. কে. এম. আবদুল আলীম (১৯৬৯)। *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

কাশীনাথ ভট্টাচার্য (১৩১৮)। *ভূদেব জীবনী*, ইন্ডিয়া প্রেস, চুঁচুড়া

দিলওয়ার হোসেন (১৯৮৪)। *বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রদোষ কুমার পাল (সম্পাদক) (১৩৬৪)। *ভূদেব-রচনাসম্ভার*, প্রথম প্রকাশ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলিকাতা

প্রণব রঞ্জন ঘোষ (১৩৭৫)। *ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মনন ও সাহিত্য*, লেখাপড়া, ১৮ বি শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা

বিজিত কুমার দত্ত (১৩৬৯)। *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, কলিকাতা

ভূদেব চৌধুরী (১৯৬০)। *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, কলিকাতা

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (১৩২৪)। *ভূদেব চরিত*, ইন্ডিয়া প্রেস, চুঁচুড়া

শেখ হবিবর রহমান (১৯৮৮)। *আলমগীর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় (১৯৮৯)। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৮৩), *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

Hobert Caunter (1836), '*The Romance of History, India*', vol. 3, *Islamic Review* (April – May 1925), Edward Churton Holles Street, London

Niccolao Manucci (Venetion), 'Storia Do Mogor or Mogul India (1553-1708) ', translate by William Irvine, Vol. 1, John Murray Albemarle Street, Published for Govt. of India – 1906, London

P. R. Sen (1996), *Western Influence in Bengali Literature,* Academic Publishers, 3rd edition, Calcutta

R. C. Majumdar, H. C. Roy Choudhuri and Kaliken Datta, *An Advanced Historyof India*, fourth edition.

RakhaMisra (1967), *Women in Mughal India (1526-17. A. D)*, 1stedn. (Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy), Netaji Subhash Marg, Delhi

Sadiq Ali, Dr. (1925), *A Vindication of Aurangzib*, Kapurthala,Punjab

Sir Jadunath Sarkar (ed.), *AShort History of Aurangzib*, Orient longman Ltd., 3rd ed.; India

Stanly Lane Poole, Aurangzib (And the Decay of the Mughal Empire), 2nd edn., Reph Quoted from Rulers of India, edt. by Sir Wilson Hunter, P. 21

V. D. Mahajan (1963), *The Sultanate of Delhi*, New Delhi, India